আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Upadhibibek Bhante

আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

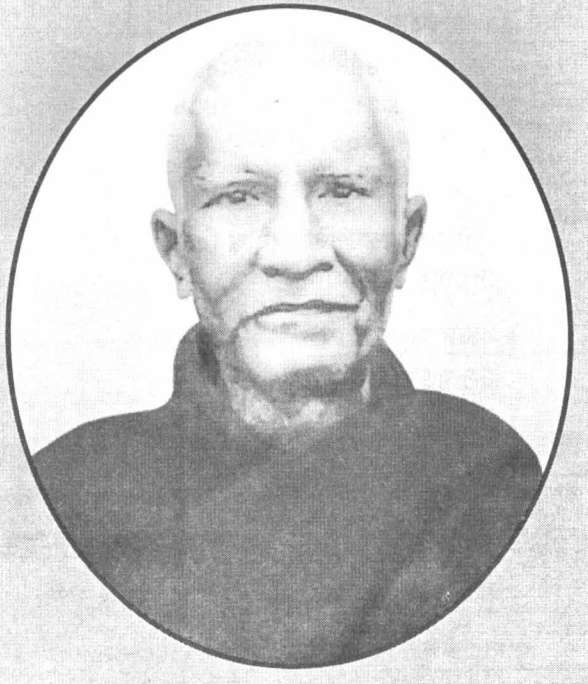

এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু

পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু

প্রকাশক ঃ

শ্রীকান্ত বড়ুয়া
সত্ত্বাধিকারী, প্রগতি আর্ট প্রেস।

প্রকাশকাল ঃ

আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির স্মৃতি জয়ন্তী
২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ, ৯ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২২ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

স্থান ঃ

পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার
দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ অলংকরণে ঃ

টিসু বড়ুয়া শাওন

কম্পোজ ঃ

রেণু এ্যাড এণ্ড প্রিন্টিং
সাত্তার ম্যানসন, মোমিন রোড
চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ২৮৬০৯০২

মুদ্রণে ঃ

প্রগতি আর্ট প্রেস
বারিক বিল্ডিং, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

A Short Biography of Most Venarable

Ariyasrabak Gyaniswar Mahastabir

by

S. Gayanmitra Bhikkhu

Purnachar International Buddhist Temple
96/A, Devpahar Lane, Chawkbazar, Chittagong.

স ম র্প ণ

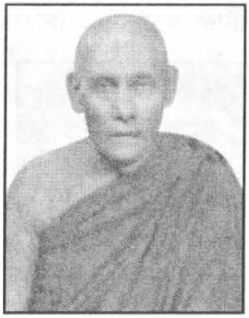
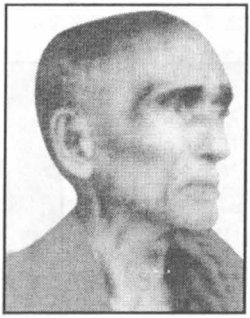
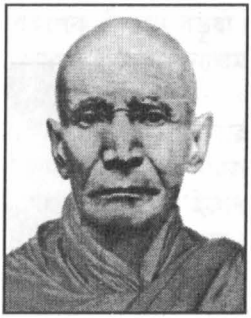

ভারত বাংলা উপমহাদেশের সংঘকুলরবি, সমাজের মঙ্গল সাধনে যাঁদের অবদান অপরিমেয়, যাঁদের আবির্ভাব সমাজে এনেছে পুণ্যস্নাত মঙ্গলাশীষ এবং যাঁরা ছিলেন আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের অগ্রজ সুহৃদ ও সহচর, সেই মহাপূজ্য সর্বজনমান্য প্রাতঃস্মরণীয় জগৎ হিতৈষী মহাপ্রাণ মনীষীত্রয় অগ্রমহাপন্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, সদ্ধর্মকীর্তি সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবির ও বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের করকমলে বিনম্র অভিবাদনে ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় এই পুস্তিকাটি সমর্পণ করছি।

দীনসেবক

এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু

উৎসর্গ

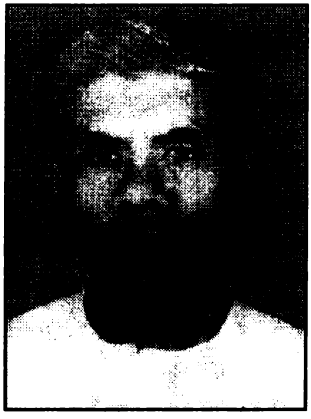

স্বর্গীয় পিতা জ্যোতিঃরত্ন বড়ুয়া
প্রতিষ্ঠাতা, অজন্তা আর্ট প্রেস
সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি
সাবেক সহ-সভাপতি, প্রেস মাসিক সমিতি, চট্টগ্রাম

স্বর্গীয়া মাতা পরিমল বড়ুয়া

স্বর্গীয় পিতা ও স্বর্গীয়া মাতার নির্বাণ সুখ কামনায় এবং পুণ্যস্মৃতি স্মরণে আর্য্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের জীবনী পুস্তক প্রকাশনায় উৎসর্গীত হলো।

শ্রদ্ধা নিবেদনে –
শ্রীকান্ত বড়ুয়া
মুকুটনাইট, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহামান্য আর্য্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীকান্ত বড়ুয়া। তিনি মুকুটনাইটে পবিত্র ভিক্ষু পরিবাসব্রত (ওয়াইক) স্মারক গ্রন্থের অন্যতম প্রকাশক।

১৯৫৬ ইংরেজীতে চট্টগ্রাম জেলার মুকুটনাইট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা স্বর্গীয় জ্যোতিঃরত্ন বড়ুয়া ছিলেন এক আদর্শ সমাজ হিতৈষী এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মা পরিমল রাণী বড়ুয়া ছিলেন এক আদর্শ পুণ্যবতী মহিলা। আর্য্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির ছিলেন তার দাদু। ছোট বেলা থেকে তার সামাজিক সাংগঠনিক দিক দিয়ে তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। স্কুল-কলেজে বিভিন্ন ম্যাগাজিন প্রকাশনায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি নৈরঞ্জনা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। যা বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্কারবাদী মুখপত্র। তিনি ১৯৭৩ সালে মুকুটনাইট সংস্কৃতি সংঘের যুগ্ম সম্পাদক, ১৯৭৮ সালে ছাত্র ইউনিয়ন সিটি কলেজ শাখার সভাপতি এবং সিটি কলেজ বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে ছাত্র ইউনিয়ন মহানগরীতে অন্যতম সাংগঠনিক কমিটিতে যোগ দেন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদের প্রচার সম্পাদক এবং ১৯৮২ সালে সাংগঠনিক সম্পাদকে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি চট্টগ্রাম আইন কলেজের বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং আইন কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৮৫ সালে পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে সম্পাদক ছিলেন। ২০০৩ ইংরেজীতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন অন্যান্য বৌদ্ধ প্রতিনিধির সাথে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সহ-সভাপতি এবং পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদকে অধিষ্ট আছেন।

এছাড়া তিনি বৌদ্ধ দেশ থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া সহ প্রতিবেশী দেশ ভারত পরিভ্রমণ করেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রগতি আর্ট প্রেস তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি ঐ প্রেসের সত্ত্বাধিকারী।

মিলন কান্তি বড়ুয়া
সম্পাদক
ত্রৈমাসিক নৈরঞ্জনা।

অভিমত

আর্যশ্রাবক মহাযোগী জ্ঞানতাপস জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির ভারত-বাংলা উপমহাদেশের একজন কীর্তিমান সংঘমনীষা। তিনি রাজাধিরাজ সংঘরাজ সারমেধ, সংঘরাজ পুর্ণাচারের যোগ্য উত্তরসুরীরূপে সংঘরাজ অভয়তিষ্য, বংশদীপ, প্রজ্ঞালোক, ধর্মরত্ন মহাস্থবিরগণের সাথে মিলে এতদঞ্চলকে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের নিগড় হতে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর জীবনাদর্শের প্রতি পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অফুরান বুদ্ধ প্রেম, ধর্মানুদর্শ ও সংঘদরদ। এমন এক মহানুভব মহাজনের সেবা ও সান্নিধ্য লাভ করে আমি ধন্য ও গর্বিত। আমার আজকের জীবনের যেটুকু প্রাপ্তি, সফলতা তা সেই মহামানবের আশীর্বাদের ফলশ্রুতি। আমার জীবনে তাঁর যে দান তা অবর্ণনীয় এবং অপরিসীম। এ মহাব্যক্তির গুণের মহৎ জীবনাদর্শের সংক্ষেপিত রূপ লিখনির মাধ্যমে প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম আমার অন্তেবাসী এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষুকে, তা সে করেছে এবং এটি প্রকাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি শ্রদ্ধেয় ভন্তেরই নাতি প্রগতি প্রেস এর সত্ত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট সমাজসেবক বাবু শ্রীকান্ত বড়ুয়াকে। তার ফলশ্রুতিতে এটি আজ প্রকাশিত হয়েছে। আমি উভয়কে আশীর্বাদ জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে কামনা করি লেখকের ও প্রকাশকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আশীষ প্রার্থনা করে ভূ-লুণ্ঠিত অশেষ প্রণাম নিবেদন করছি আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের পবিত্র পদ পঙ্কজে।

কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাথের
প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি ও অধ্যক্ষ
পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার
দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

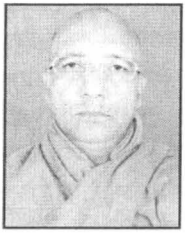

অভিমত

"দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জায়তি
যত্থ সো জাযতি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি।"

"দুর্লভ পুরুষগণ যত্রতত্র জন্ম গ্রহণ করেন না। যেখানে তাঁরা জন্ম নেন সেই দেশ, কুল ও জাতি ধন্য হয়।"

জ্ঞান ও ধ্যানযোগী আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির ভারত-বাংলা উপমহাদেশে থেরবাদ রেনেসাঁর ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি বার্মা ও শ্রীলংকায় শিক্ষা নিয়ে তাঁর অধিগত শিক্ষা এদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য বিলিয়েছেন। সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবির, বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবির, অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির প্রমুখ নমস্য ও বরেণ্য সংঘকূলরবিগণের সাথে একাত্ম হয়ে তিনি এ অঞ্চলে করেছিলেন অপূর্ব ধর্মাভিযান। তিনি আমাদের জন্য প্রাতঃস্মরণীয় ও দুর্লভ মানব। ধর্মপদের উপরোক্ত গাথানুসারে তাঁর মত দুর্লভ ভিক্ষুর জন্মে ও কর্মে এ সমাজ ও জাতি হয়েছে ধন্য এবং গর্বিত। এমন একজন মহাপুরুষের জীবনী সংক্ষেপ রচনার মাধ্যমে আয়ুষ্মান স্নেহভাজন এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু সাধুবাদযোগ্য কাজ করেছে। আমি শ্রদ্ধেয় আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের চরণতলে বন্দনা ও লেখকের সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি।

লোকপ্রিয় মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
উঃ পুরানগড় সার্বজনীন সংঘশ্রী বিহার
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রসঙ্গ কথা

"সব ধরতি কাগজ করূ, লেখনি সব বনরায়,
সাত সমুদ্র কী মসী করূ, গুরু গুন লিখন যায়।"

উপরোক্ত শ্লোকটি কবির নামক এক প্রখ্যাত কবির। এ শ্লোকটির বাংলা করলে অর্থ হয়, গুরুর গুণের কথা লিখে শেষ করা যায় না। সারা দুনিয়াকে যদি কাগজ করা হয় এবং বন জঙ্গলকে যদি কলম করা হয় ও তৎসঙ্গে সাত সমুদ্রের জলকে যদি কালি হিসেবে ব্যবহার করে লিখতে বসা হয় তাহলেও গুরুর গুণের কথা সম্পূর্ণ হবে না।

এই কথার সাথে সুর মিলিয়ে বলা চলে জ্ঞানতাপস আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের মতন মহান গুরুর গুণের কথাও লিখে শেষ করা যাবে না। তিনি ছিলেন একাধারে বুদ্ধপুত্র ভিক্ষু, লেখক, সংস্কারক, চিকিৎসক, সদ্ধর্মের আধ্যাত্মিক গবেষক, মহান বিদর্শক ও অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সংঘব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের প্রতি খাঁজে খাঁজে ছড়ানো ছিল বুদ্ধলীলার আভাময় বর্ণিল পূণ্য প্রপাত। তাঁর সম্পর্কে কলম ধরা আমি অভাজনের পক্ষে ধৃষ্ঠতা বৈকি! তথাপি তাঁর অদৃশ্য আশীষ শিরোভূষণ করে ও তাঁর প্রত্যক্ষ সেবকান্যতম ও আশীর্বাদপুষ্ট পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারসহ বেশ কিছু স্বনামখ্যাত মানবতার চর্চাকারী প্রতিষ্ঠানের জনক, মদীয় সীমাচার্য, অনাথপিতা কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাথের কর্তৃক চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আদিষ্ট হয়ে এ অর্বাচীন মহান আর্যপুদ্গলের জীবনী সংক্ষেপ লিখার প্রয়াস পেয়েছি তাঁরই স্মৃতি জয়ন্তী উপলক্ষে। আমাকে কলম ধরে ভন্তের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের সুযোগ ও ভন্তের আশীর্বাদ প্রাপ্তির হেতু করে দেবার জন্য শ্রদ্ধেয় সীমাগুরু কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাস্থবির মহোদয়ের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা সমেত বিনম্র বন্দনা। ভন্তের জীবনের সার্বিক দিক নিয়ে আসতে মোটেও সক্ষম হয়নি এবং আমার পক্ষে অসম্ভবও বটে, তা অকপটে ও অধোশিরে স্বীকার করছি। চেষ্টা ছিল তাঁর জীবনের চুম্বক অংশগুলো এক সুতোয় গেঁথে সুধীজন ও তাঁর ভক্তানুরাগীদের জন্য উপস্থাপন করার এবং তাই সকলের বোধ্যগম্যতার জন্য বন্ধনীতে 'সংক্ষিপ্ত জীবনী' কথাটি লিখা হয়েছে।

কল্যাণমিত্র উপাসক, আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর ভন্তের গৃহী সম্পর্কে নাতি, প্রগতি আর্ট প্রেসের সত্ত্বাধিকারী, বিশিষ্ট সমাজসেবক বাবু শ্রীকান্ত বড়ুয়া এই পুস্তিকাটি প্রকাশের ভার নিয়ে সমাজের মহত্বর হিত সাধন ও আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

এটি লিখতে গিয়ে আমি সহায়তা নিয়েছি অতিবন্দ্য আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, মহামান্য সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাথের, ড. জিনবোধি ভিক্ষু, অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের, কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ভিক্খু ধর্মেশ্বর, জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু, অধ্যাপক অর্থদর্শী বড়ুয়া প্রমুখের লিখা হতে। আমি তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য বন্দনা, মৈত্রী ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের সকল ভিক্ষু-শ্রামণ, আবাসিক ছাত্র, বিহার পরিচালনা কমিটি ও আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের স্মৃতি জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির প্রতি অপ্রমেয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সামগ্রিক ত্রুটি নিজের কাঁধে নিয়ে, গুণোত্তম মহান সংঘের আশীষ প্রার্থনা করে এবং অবাঞ্ছিত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অতিপূজ্য আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর ভন্তের শ্রী চরণে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক প্রসঙ্গ কথার পরিসমাপ্তি করলাম।

প্রণত:

এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু

পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির

স্মৃতি জয়ন্তী - ২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষ

৯ বৈশাখ ১৪১৮ বাংলা

২২ এপ্রিল, ২০১১ ইং শুক্রবার

আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

নশ্বর এ ধরণীতে কালে কালে কত মানুষ জন্ম নিচ্ছে আর কত মানুষ যে মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসা-যাওয়ার চিরন্তন এ খেলার খেলোয়াড় মানুষ সকলেই মানব মনে দাগ কাটতে পারে না, সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না বা সকলে সম্ভব করতে পারে না আত্মহিত এবং পরহিত সাধন করে মানব মনোমন্দিরে সুদীর্ঘকাল বা অনন্তকালব্যাপী দেদীপ্যমান হয়ে থাকতে। যাঁরা পারে তাঁরা হন মহান তথা মহতোত্তম। তাঁদের মত মহাপুরুষ জগতের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁদের এ ভূ-মন্ডলে আগমনে ধরিত্রী হয় ঋদ্ধ এবং গৌরবান্বিত। তাঁরা সাধন করেন নিজ কল্যাণ এবং পর কল্যাণ। তেমনি একজন মহাজন মহাত্মা মানব হলেন আদর্শ বুদ্ধপুত্র, আর্যশ্রাবক, মহাযোগী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, জ্ঞানতাপস জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির মহোদয়।

আবির্ভাব ঃ শ্যামলিমা বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যঋদ্ধ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানা সমগ্র বৌদ্ধ সমাজে আপন মহিমায় ভাস্বর। এ পটিয়া থানার মুকুটনাইট গ্রামে বিত্তশালী ধার্মিক উপাসক হরিরাজ বড়ুয়া ও তৎপত্নী শ্রদ্ধাবতী ধর্মশীলা উপাসিকা তারাদেবীর সুখের সংসারে ১৮৮৭ সালের ২০ ডিসেম্বর, রবিবার ভাবীকালের আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির জন্মগ্রহণ করেন। শিশুর কোমল ও চন্দ্রিমাভা বদনমণ্ডল দেখে নাম রাখা হয় ললিত চন্দ্র। ললিত অর্থ কোমল আর চন্দ্র অর্থ চাঁদ। সত্যিই দেখা যায় তাঁর জীবনে তিনি চন্দ্রের স্নিগ্ধ কোমল আলোর ন্যায় রমিত হয়েছিলেন 'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়' বুদ্ধ বাণীর যথার্থ অনুসরণ ও অনুশীলন করে।

শিক্ষা জীবন ঃ নবজাতক ললিত চন্দ্র ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল চন্দ্রকলাসম। ক্রমে তাঁর বয়স শিক্ষা গ্রহণোপযোগী হলে মাতা-পিতা তাঁকে সাগ্রহে ভর্তি করে দেন স্বগ্রামের পাঠশালায়। তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত হলে পিতা তাঁকে ভর্তি করে দেন পার্শ্ববর্তী গৈড়লার সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে। তিনি 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ' এ বাণীকে ধারণ করে সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত জ্ঞানসিন্ধুবারি রাশিতে অবগাহনের মধ্য দিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর মেধা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মাধুর্যে তিনি চতুষ্পাঠিতে পন্ডিতের মন দখল করে নেন। সেখানকার পন্ডিতের পরামর্শে আরো উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্তে পিতা তাঁকে নিয়ে যান তৎকালীন বিদগ্ধ অধ্যাপক রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট। অধ্যাপক মহোদয় ললিত চন্দ্রের প্রতিভা আঁচ

করে এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে নব ছাত্রের প্রতি অপত্য স্নেহে তাঁর শিক্ষার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। সযত্নে তিনি ছাত্রকে শিক্ষা দেন কাব্য ও ব্যাকরণ। ছাত্রও মনানন্দে গ্রহণ করতে লাগলেন গুরুদত্ত বিদ্যা এবং নিজেকে ক্রমে প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন বিদ্বান রূপে। তৎসঙ্গে ললিত চন্দ্র আরও শিক্ষা নিলেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এবং তাতে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করলেন।
পরবর্তীতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একজন সুদক্ষ কবিরাজ হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা ঃ ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাইশ বছর বয়সে সফর আলী মুন্সীর হাটে ললিত চন্দ্র কর্মজীবন শুরু করেন আয়ুর্ব্বেদী চিকিৎসালয় স্থাপনের মধ্যদিয়ে। তাঁর রোগী সেবাপরায়নতা, নিষ্ঠতা ও আচরণে সকলের মধ্যে তিনি সুদক্ষ কবিরাজ রূপে সমাদৃত হন অচিরেই। পিতা হরিরাজ বড়ুয়া পুত্রের সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে এবং পুত্রের বয়স ও যোগ্যতা উপলব্ধি করে তাঁকে সংসারী করার মনস্থির করলেন এবং উদ্যোগী হয়ে পড়লেন উপযুক্ত পাত্রী সন্ধানে। কিন্তু যাঁর জীবন পরার্থে, যিনি এসেছেন সংসারের মোহ বন্ধন ছিন্ন করে বন্ধনহীন বিমোক্ষ জীবন যাপনের জন্য, তিনি কি সংসারী হতে পারেন? সুতরাং জন্মান্তরীণ শুভ্র কুশল সংস্কারের প্রভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত হল সংসার ত্যাগের নিমিত্ত। এ প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্য, প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক ও লেখক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী লিখেছেন, "রৌদ্রকরোজ্জ্বল শীতের প্রভাত। নব যৌবনোদ্দীপ্ত গৌরতনু তরুণ-কবিরাজ ফিরছেন রোগী দেখে। তাঁর চিকিৎসালয়ের অদূরেই লোকের ভিড় দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে যা দেখলেন তাতে মনের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল। একটি অর্ধমৃত পৌঢ় লোক মাটিতে পড়ে আছে। তাকে ঘিরেই লোকের ভিড় জমেছে। চোর সন্দেহে কিল চড় লাথির চোটেই তার এ অবস্থা। তরুণ কবিরাজের বুক থেকে বেরিয়ে এল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তিনি অস্ফুষ্ট স্বরে বলে উঠলেন, উঃ সংসারে এত জ্বালা এত দুঃখ। এ জ্বালার অন্ত কোথায়? মনের এ প্রশ্নটি তাঁকে টেনে নিয়ে যায় বৈরাগ্যের পানে। তিনি হন ভিক্ষু এবং পরবর্তী জীবনে রূপান্তরিত হন মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর রূপে।" এ প্রেক্ষাপটে কাব্যকারে বলা চলে –

"সুদক্ষ কবিরাজ ললিত মোহন
চোরের দুর্দশা হেরি হৃদয়ে দহন,
মায়া মোহ সংসার ত্যাজিয়া ধীরে
প্রব্রজ্যা গ্রহিলেন নির্বাণ নীরে।"

হৃদয়ে সংসারের দুঃখ দহনের জ্বালা চিন্তা করতে করতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, না; আর নয় এ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে, প্রব্রজ্যাই একমাত্র মুক্তির পথ, উন্মুক্ত আকাশতুল্য প্রব্রজ্যা নিতে হবে। কিন্তু চিন্তায় পড়ে

গেলেন, কেননা, তাঁর পিতা তো তাঁকে অনুমতি দেবে না। চিন্তা করতে করতে উপায়কুশল পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন ললিত চন্দ্র শরণাপন্ন হন তদীয় আত্মীয় পাঁচুরিয়া নিবাসী কবিরাজ হীরাসিং বড়ুয়ার। তাকে খুলে বললেন সুপ্ত অথচ উদগ্র মনোবাসনার কথা। ললিত চন্দ্রকে আশ্বস্থ করে কবিরাজ হীরাসিং বড়ুয়া হরিরাজ বড়ুয়াকে ললিত চন্দ্রের ইচ্ছার কথা বললেন। হীরাসিং বড়ুয়ার কথায় ললিত চন্দ্রের পিতা হরিরাজ প্রথমে অতি ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু পরে তেজস্বী, নির্ভীক, ন্যায়নিষ্ঠ, ধী-শক্তি সম্পন্ন, শীলপরায়ণ, প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে খ্যাত জগচ্চন্দ্র মহাস্থবিরের নিকট বুদ্ধ শাসনে পুত্রদানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে সম্মত হন পুত্রের প্রব্রজ্যায়। ললিত চন্দ্র আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হল। তিনি পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে ও গৈরিক বুদ্ধ বসন অঙ্গে আবৃত করে বাঙালি প্রথম সংঘরাজ, উপমহাদেশে থেরবাদ পুনঃজাগরণের অগ্রপুরোধা, শ্রীলংকা রামাঞ্ঞা নিকায়ের প্রতিষ্ঠাতা, পুণ্য পুরুষ, আচারিয়া পূর্ণাচার ধর্মাধারী চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের প্রত্যক্ষ শিষ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ জগচ্চন্দ্র মহাস্থবির নিকট গ্রহণ করলেন শ্রামণ্য জীবন। মনে তাঁর অপার আনন্দ, চিত্ত হল অভিপ্রসন্ন। এই অভিপ্রসন্ন মনেই তিনি শ্রামণ্য জীবনের নিয়মাবলী অনুশীলন পূর্বক অনতিকাল পরেই পূণ্যতীর্থ ঠেগরপুনির খরস্রোতা শ্রীমতি নদীর স্বচ্ছ সলিল সীমায় জগচ্চন্দ্র মহাস্থবিরের উদ্যোগে লাভ করলেন শুভ উপসম্পদা। পূর্বেই বলা হয়েছে ললিত চন্দ্র ছিলেন অতি মেধাবী, বিনয়ী ও জ্ঞানপিপাসু এবং তাই নব উপসম্পন্ন ভিক্ষুর নামকরণ করা হল জ্ঞানীশ্বর। আচার্যের বিচক্ষণ জ্ঞানের প্রদত্ত নাম তাঁর জীবনে সার্থক হয়েই ছিল। তিনি পরবর্তীতে জ্ঞানব্রতী হয়ে জ্ঞানকে আয়ত্ত করে জ্ঞান প্রদায়ক প্রজ্ঞারই অধিকারী হয়েছিলেন। আর এ প্রজ্ঞাকে অধিকার করতে তিনি করেছিলেন সংযম আচরণ, শীলের অনুধ্যান, ব্রহ্মবিহার আচরণ তথা বিদর্শন ধ্যানযোগ।

ব্রহ্মদেশে যাত্রা ঃ শ্রদ্ধেয় মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির যখন নবীন ভিক্ষু সে সময় বংগীয় বৌদ্ধগণ ছিল আলো আঁধারি অবস্থায়। তখনো এ দেশীয় বৌদ্ধগণ মুক্ত হতে পারেনি বিবিধ কুসংস্কার ও অধর্মাচার হতে। তাই নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর তাঁর অন্তরের প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ ও অদম্য জ্ঞানস্পৃহার জোরে ছুটে যেতে চান অসীম জ্ঞানরাজ্যের পানে। তাঁর মন আকুঁপাকুঁ করে উঠল ক্ষুদ্র পল্লীর গন্ডী ছাড়িয়ে যেখানে সম্বুদ্ধের শিক্ষা প্রভাবিত অঞ্চল সেখানে ছুটে গিয়ে ধর্ম শিক্ষা নিতে।

বাংলা ভারত উপমহাদেশের আরেক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, বিদগ্ধ পন্ডিত, লেখক, নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবির। যিনি ছিলেন আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের সমসাময়িক অগ্রজ। তিনি তখন ধর্মশিক্ষায় নিয়োজিত হয়ে ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মায়ানমার) মৌলমেন নগরীর বৈজয়ন্ত বিহারে অবস্থান করতেন। ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরের অত্যুগ্র জ্ঞানস্পৃহার অদম্য

বাসনা জানতে পেরেই যেন তিনি চিঠি প্রেরণ করলেন ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরের নিকট। চিঠি পেয়ে ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরতো অতি আনন্দিত হয়ে গেলেন, মনে হল যেন আকাশের চাঁদ হাতে এসেছে। ১৯১০ সাল প্রায় বিদায় প্রান্তে, সে সময় ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর ধর্মরাজ্যে বিচরণের প্রভূত মনোবাঞ্ছা নিয়ে এখানকার তল্পিতল্পা গুটিয়ে যাত্রা করলেন রেঙ্গুন অভিমুখে। সেখানে পৌঁছে আবার যাত্রা করলেন মৌলমেনের সুপ্রসিদ্ধ বৈজয়ন্ত বিহারের উদ্দেশ্যে। ক্রমে বৈজয়ন্ত বিহারে পৌঁছে তিনি গুরুরূপে লাভ করলেন বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের গুরু বৈজয়ন্ত বিহারাধিপতি মহাপন্ডিত উঃ সাগর মহাস্থবিরকে। সেই মহাপন্ডিতের তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষা করতে লাগলেন ধর্ম ও বিনয়। মহাপন্ডিত মহাস্থবিরও নব দীক্ষিত ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরের শান্ত সংযত চলন ও নমনীয় ভাবভঙ্গি দেখে সাদরে শিক্ষা দিতে লাগলেন পুত্রবৎ। ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনের দরুণ ত্রিপিটক অধ্যয়নে তাঁকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। সেখানে তিনি বিনয় অধ্যয়নকালে চট্টগ্রামে লব্ধ উপসম্পদা বিষয়ে সন্দিহান হন। তাই তিনি বিনয়ের প্রতি অসীম গারবতায় উঃ সাগর মহাস্থবিরের উপাধ্যায়াত্বে দ্বিতীয় বার উপসম্পদা গ্রহণ করেন।

শ্রীলংকায় শিক্ষা ঃ মহানায়ক মহাচার্য উপসেন মহাস্থবির; যিনি সমগ্র থেরবাদী বৌদ্ধ জগতের বিশ্রুত মহাপন্ডিত, অত্যুৎকৃষ্ট পালি গ্রন্থ 'নেত্তিরতনকরো' সহ অনেক গ্রন্থ রচয়িতা, অমিত বাগ্মীতা ও ধী শক্তির অধিকারী, বিনয়াচার্য, বাঙালিদের প্রতি অপরিসীম স্নেহপ্রবণ এবং ভারত বাংলা উপমহাদেশে থেরবাদ পুনরুজ্জীবনের অগ্রসেনানী, পূত চরিত্রধারী অগ্রমহাপন্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ষষ্ঠ সংঘরাজ ধর্মানন্দ মহাস্থবির, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির, বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাস্থবির, তত্ত্বভূষণ পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, অষ্টম সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবির, ড. বি জিনানন্দ, ড. অনোমদর্শী, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ শাসনহিতৈষী পন্ডিতগণের মহাচার্য। তিনি তখন শ্রীলংকার নালন্দা খ্যাত পানাদূরার সদ্ধর্মোদয় পরিবেনে শিক্ষাদানে নিরত ছিলেন। ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরের পরম কল্যাণমিত্র অগ্রজ সুহৃদ বংশদীপ ভান্তেও তথায় গিয়েছেন শিক্ষা গ্রহণের মানসে। ভিক্ষু বংশদীপ ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরকে পত্র লিখলেন তথাকার সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষার গভীরতা বর্ণনা করে। পত্র লাভ করে উচ্চ শিক্ষার মানসে ১৯১২ সালে জ্ঞানপিপাসু ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর ব্রহ্মদেশ হতে পানাদূরার সেই সদ্ধর্মোদয় পরিবেনে চলে গেলেন এবং মহানায়ক উপসেন মহাস্থবিরের স্নেহচ্ছায়ায় পূর্ণোদ্দ্যমে শাস্ত্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। সেখানে অবস্থানকালে মহানায়ক উপসেন মহাস্থবিরের গুরু অরণ্যচারী মহাসাধক শুদ্ধমুক্ত মহাভিক্ষু সুমন মহাস্থবিরের নিকট মাতরা জেলায় কিরিন্দা অরণ্যাশ্রমের নয়নাভিরাম পরিবেশে তৃতীয়বার উপসম্পদা গ্রহণ করেন। এ মহামানবের উপাধ্যায়াত্বে মহামহিম উপসম্পদা

লাভ করে ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর নিজেকে আরো গর্বিত ও উদ্যমী করে গভীর অনুরাগে শিক্ষা নিতে লাগলেন ধর্মরাজ্যের বিপুল জ্ঞান।

১৯১৪ সাল, সমগ্র বিশ্ব বিশ্বযুদ্ধের মর্মবিদারণ নিপীড়নে স্তব্ধ, মানবতা ভূ-লুণ্ঠিত, আর তারই অশুভ প্রতিক্রিয়ার ফলসরূপ তৎকালীন সিংহলে দেখা দেয় অভূতপূর্ব মন্বন্তর। ফলতঃ বহুলোক অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যুর হিমশীতল ক্রোড়ে পতিত হয়। এ দুর্যোগ উপেক্ষা করে প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় অনাহারে অর্ধাহারে বিবিধ ক্লেশ স্বীকার করে ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর আপন কর্তব্য সাধনে নিরত থাকেন। সে সময় শিক্ষার্থী জ্ঞানীশ্বর অপ্রমেয় ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা ও ধর্মপ্রাণতায় গুরুর অকৃপণ স্নেহধারা লাভ করে ধন্য হন। ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরও শাস্ত্রের–

"গুরু ব্রহ্মা, গুরু-বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম....."

শাস্ত্রের এই আপ্ত বাক্যকে ধারণ করে গুরুর প্রতি দেখিয়েছেন পরমভক্তি। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে তিনি একদিন তাঁর আচার্য মহাস্থবির উপসেন ভান্তেকে স্নান করানোর সময় দেখতে পেলেন একটা বিষধর সাপ ফণা তুলে ছোবল মারার উপক্রম করছে, তখনি তিনি তা ধরে ফেলে গুরুকে সমূহ বিপদ হতে রক্ষা করেন। এভাবে গুরু সেবায় নিয়োজিত থেকে গুরুর সান্নিধ্যে তিনি লাভ করেন অর্থকথাসহ ত্রিপিটকের উপর বিপুল পারদর্শিতা। শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে –

"পণ্ডিতো সুত সম্পন্নো অত্থীতি চে সুতো
সমুস্সাহেন তং ঠানং গন্তব্বং চ সুতেসিনা।"

বিদ্যার্থী, শিক্ষাকামী, শিশিক্ষু ব্যক্তিরা যেখানে বহুশ্রুত, শাস্ত্রজ্ঞ, অভিজ্ঞ অবস্থান করেন, বিদ্যার্জনের জন্য মহোৎসাহে দ্রুত গতিতে তারা সেখানে গমন করেন। এটাই শিক্ষাকামীর প্রধানতম লক্ষণ।

উক্ত গুণ বা লক্ষণ সমুদয় জ্ঞানীশ্বরের মধ্যে ছিল। আর তাই তিনি শিক্ষার নিমিত্তে গিয়েছিলেন গ্রাম্য পাঠশালায়, গৈড়লার সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে, ঠেগরপুনিতে এবং সুদূর মায়ানমার ও শ্রীলংকায়। তজ্জন্যই তিনি হয়েছিলেন কৃতবিদ্য মহাবিদ্বান ও মহাভিক্ষু।

স্বদেশে ঃ তথাগত সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বলেছেন – "জ্ঞাতির ছায়া সুশীতল।" পন্ডিতেরা বলেন – "জননীশ্চ জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও জন্মভূমির গরীমায় গরীয়ান হয়ে বলেছেন –

"নমো নমো নমো সুন্দরীমম
জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।"

এভাবে দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, জীবনানন্দ দাশ, কবি নজরুল, সুভাষ বসু, মার্টিন লুথার কিং, মাও সেতুং, নেলসন ম্যাণ্ডেলাসহ বিবিধ মহাকবি ও মনীষীগণ জন্মভূমির বন্দনায় হয়েছেন ভাবে গদ্‌গদ্। তেমনি মহাভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরও

উপলব্ধি করলেন তাঁর জন্মভূমি পিপাসার্ত। স্বীয় অধিগত বিদ্যারূপ সুশীতল বারি দিয়ে তাদের পিপাসা নিবারণ করা ধর্ম ও জ্ঞাতিকর্তব্য। তাই তিনি মনস্থির করলেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য। তিনি জন্মভূমিতে সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ১৯১৫-১৬ সালের দিকে ফিরে আসলেন স্বদেশে। জন্মস্থান মুকুটনাইটের জনগণ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার্ঘ দিয়ে বরণ করে নিলেন কৃতবিদ্য এ মহাভিক্ষুকে। সেখানে সেই বর্ষা যাপন করে পরবর্তী বর্ষা যাপন করলেন পার্শ্ববর্তী চরকানাই গ্রামে। এ দু'স্থানেও চলল শাস্ত্রাধ্যায়ন ও মনন। জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির যেখানেই গেছেন সেখানেই শুধু যেন জ্ঞানানুন্ধানে নিরত ছিলেন। তাই তিনি পরবর্তীতে সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন যোগসিদ্ধ আর্যশ্রাবকরূপে। আর তাই শাস্ত্রের –

"নহি জ্ঞানেন সদৃশাং পবিত্রমিহবিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনিবিন্দতি"

জ্ঞানের মত পবিত্র কিছু নেই, জ্ঞানী ব্যক্তিই যোগসিদ্ধ; এই অমিয় বাক্যটি তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল শতভাগ।

কর্মপ্রয়াস ঃ ১৯১৯ সালে স্বদেশ স্বজাতির কল্যাণ কামনায় ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরের কর্মযজ্ঞ শুরু হয় সুধন পূর্ণাচার প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের পূতস্থান উনাইনপুরা লংকারামে। সে সময় হতে সুদীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর ব্যাপী তাঁর মহামহিম মহাজীবনের বহুবিধ পুণ্যপূত স্মৃতির জন্য এ বিহার বৌদ্ধ সমাজের ইতিহাসে দেদীপ্যমান। প্রথমতঃ তাঁর কর্ম প্রতিভার বিকাশ পরিলক্ষিত হয় সমাজ সংস্কার, বিহারোন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারে। তাঁর কর্মকুশলতায় এবং তৎকালীন সমাজ দরদী মহাত্মাগণের আন্তরিকতায় সমাজের বিবিধ কুসংস্কার নির্মূল হয়। প্রজ্ঞালোক বংশদীপ মহাস্থবিরদ্বয়ের সাথে একাত্ম হয়ে মহাভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর চট্টগ্রামে প্রথম কঠিন চীবর দানের প্রবর্তন করেন। এছাড়া অষ্টপরিষ্কার দান, সংঘদান, শ্রী মহাবোধি পূজা, সপ্তমহাস্থান পূজা, মধু পূর্ণিমা ও বিবিধ পর্বদিন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের রীতি চালুর ক্ষেত্রেও তিনি অশেষ অবদান রাখেন, যা সমাজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ সময় সপ্তম সংঘরাজ সদ্ধর্মকীর্তি অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের নির্দেশনায় এবং বংশদীপ, প্রজ্ঞালোক জ্ঞানীশ্বর, ধর্মরত্ন প্রমুখ সংঘ সন্তানদের ধর্ম বিনয় শিক্ষায় সমাজে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সমাজের পশ্চাদমুখীনতা পরিবর্তন হয়ে সমাজ চলতে থাকে প্রগতির দিকে নবগতি নিয়ে। উনাইনপুরা জাত আরেক সূর্য সন্তান অনন্য কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের বিশ্বস্ত সহযোগীরূপে উনাইনপুরা লংকারামের সংস্কার সাধন করেন ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর। ফলতঃ লংকারাম হয়ে উঠে তৎকালীন সময়ের অনুপম ধর্মচর্চার সুপরিবেশিত বিহার। স্বীয় জন্মস্থান মুকুটনাইটে পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেন উপাসনালয়। যা একজন সংসার ত্যাগী বুদ্ধ শিষ্য হয়েও মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুপম দৃষ্টান্ত। কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির ভিক্ষু জ্ঞানীশ্বরের

কর্মপ্রতিভা আঁচ করে তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মহানগরীর ধর্মাংকুর বিহারের উত্তরসূরী মনোনীত করতে চাইলে নিজের সাধনার অন্তরায় হবে মনে করে জনকোলাহল পূর্ণ নগরীর বিহারে যাননি, কিন্তু পরবর্তীতে তদীয় শিষ্য ধর্মপাল ভিক্ষুকে পাঠিয়েছিলেন। যিনি কালক্রমে অখিল ভারতীয় সংঘনায়ক এবং ধর্মাংকুরের কর্মাধ্যক্ষ ও সভাপতিরূপে সমাজের বৃহত্তর হিত সাধন করেছিলেন।

গ্রন্থ প্রণয়ন ঃ

অধং ঘটং ঘোষনং যেচ্চ শব্দং
সম্পূর্ণ কুম্ভং ন করোতি শব্দং
প্রহীন বিদ্যা প্রকরোতি গর্বং
সম্পূর্ণ বিদ্যান করোতি গর্বং

অর্ধেক পূর্ণ কলসীর শব্দ বেশি। পূর্ণ কলসীর শব্দ নেই। বিদ্যাহীন ব্যক্তির গর্ব বেশি। বিদ্বান ব্যক্তির গর্ব নেই।

উপরোক্ত অমৃত বচনের মত মহাস্থবির জ্ঞানীশ্বর ছিলেন প্রকৃত বিদ্বান কিন্তু গর্বহীন এবং এ মানসিকতা নিয়ে তিনি স্বীয় অধীত বিদ্যা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ণাচার পালি বিদ্যালয়। ১৯২৭ সন হতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি পরিষদের পালি উপাধি পরীক্ষায় বহু ছাত্র কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে অনেকবার স্বর্ণপদক লাভ করেন এ বিদ্যালয় হতে। তিনি অনেককে পালি শিক্ষা দান করে প্রজ্জ্বলন করেছিলেন সদ্ধর্মের আলো। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্ম হল গ্রন্থ রচনা করে সদ্ধর্মের প্রচার ও প্রসার। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কচ্চায়নবুত্তি, মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতারের সারতত্ত্ব নিয়ে লিখিত 'পালি প্রবেশ' যা কলিকাতা, গৌহাটি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য এবং তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হল ধাতুকোষ, বুত্তোদয়; পান্ডুলিপি হল পালি অভিধান, প্রাতিমোক্ষ ও অভিধর্মার্থ সংগ্রহ। সেগুলোর বহুল প্রকাশ ও প্রচারে সাধিত হবে সমাজের বিশদ মঙ্গল।

তীর্থ ভ্রমণ ঃ বুদ্ধ ভগবান আনন্দ স্থবিরকে বলেছিলেন যে, চারি তীর্থস্থান যাঁরা দর্শন করবে তাঁদের প্রভূত পূণ্য সাধিত হবে। মহাস্থবির জ্ঞানীশ্বর যেন সে বিষয় চিন্তা করে কর্মযোগী কৃপাশরণ ও বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের সাথে ১৯১৮ সালে প্রথম তীর্থ পর্যটন করেন এবং এরপর তিনি বহুবার বুদ্ধগয়া, কুশীনগর, সারনাথ, লুম্বিনী, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ এবং বার্মা ও শ্রীলংকার বিভিন্ন দর্শনীয় ও পূণ্যসঞ্চয়ী তীর্থ দর্শন করেন।

সাধন-জীবন ঃ গীতায় বলা হয়েছে –

"তপস্বিভ্য অধিকযোগী,
জ্ঞানীভ্যস অপি ততোধিকঃ কর্মিভ্যশ্চ অধিকযোগী .....।"

যোগীগণ তপস্বী হতেও শ্রেয়তর, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কর্মী হতে উত্তম...। মহাভিক্ষু জ্ঞানীশ্বর ছিলেন একজন প্রকৃত যোগী। তিনি বুদ্ধের "ঝায় ভিক্খু

মা চ পমাদো" হে ভিক্ষু ধ্যান কর, প্রমাদিত হয়ো না এ আদেশকে শিরোধার্য করে পাঁচরিয়ার সাধক যজ্ঞেশ্বর বড়ুয়ার পরামর্শে গুমানমর্দনজাত আর্যশ্রাবক রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দীর নিকট ১৯৩৫-৩৬ সালের দিকে শিক্ষা নিলেন বিদর্শন ধ্যানযোগ। উল্লেখ্য ১৯৩২ সালে ডাইকু সাধনাকেন্দ্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে জ্ঞানীশ্বরের সাথে রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দীর সাক্ষাত হয়েছিল। ধ্যানের উৎকর্ষতা সাধন করায় গুরু আর্যশ্রাবক রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী তাঁকে আর্যশ্রাবক উপাধি দান করেন। তাঁর জীবন ছিল অধ্যাত্ম সাধনায় পূর্ণ কলসী সদৃশ। তাঁর মতে "মানব জীবনে সার্থকতা সম্পাদন করতে হলে চাই অধ্যাত্ম সাধনা। অনাদিকাল হতে এই অধ্যাত্ম সাধনা মানবের চিন্তা ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি করে জীবনের উপর নুতন আলোকপাত করে চলেছে। যাঁরা মানব জাতিকে অধ্যাত্ম সাধনার গূঢ়মন্ত্র দান করেছেন তাঁরা জগতে চির নমস্য।" পূজ্যপাদ জ্ঞানীশ্বর ভন্তের উক্তির সূত্র ধরেই বলা চলে, তিনি যেহেতু অধ্যাত্ম সাধনার বরপুত্র রূপে ধ্যান করে গুরু কর্তৃক আর্যশ্রাবক উপাধি লাভ করেছিলেন সেহেতু তিনি আমাদের চির নমস্যজন।

অলৌকিকতা ঃ মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরকে বুঝা আমাদের মত সাধারণের পক্ষে অবান্তর প্রয়াস মাত্র। কিন্তু তিনি যে ধ্যানের ভিতর অনেক উন্নতি লাভ করেছেন তা তাঁর অলৌকিক কিছু কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমরা অর্বাচীনেরা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারি। যেমন উনাইনপুরায় অবস্থানকালে তদীয় শিষ্য জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু কর্তৃক নির্মিত পূর্ব-পশ্চিম লম্বা চক্রমণ ঘর বিবেকালয়ে ধ্যান করার সময় একদা গ্রামের ছেলেরা হরীতকী, বহেরা খুঁজতে এলে তাঁরা একটি সাপ দেখে শোরগোল শুরু করে, তখন রাস্তা দিয়ে যাওয়া জনৈক মরিচ বিক্রেতা লাঠি দিয়ে সাপ মারতে এলে করুণাপ্রবণ জ্ঞানীশ্বর সাপটি হাতে ধরে একটি পাত্রে ভরে ফেলেন।

তিনি একদা তার শিষ্য সেবক বর্তমান দ্বাদশ সংঘরাজ ধর্মসেন ভান্তেকে বলেছিলেন পানি পান করবেন না, পানির বদলে মধু পান করবেন। ধর্মসেন ভান্তেতো বিপদে পড়ে গেলেন, কিভাবে হবে প্রতিনিয়ত পানের জন্য মধুর জোগাড়! কিন্তু দেখা গেল এমতাবস্থায় এক মধু বিক্রেতা এসে উপস্থিত এবং তিনি রাজি হয়ে গেলেন আজীবন মধু দেবার জন্য। সেই হতে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর ভান্তে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে ১৫ বছর মধু পান করেছিলেন। যা ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলেই মনে হয়। ১৯৫২-৫৩ সালের দিকে ঢাকা থেকে এক ব্যক্তি এসে প্রার্থনা জানাল ভান্তের শরীর লেহন করার জন্য। ভান্তে রাজী হলেন না, শেষে বর্তমান সংঘরাজের অনুরোধে লোকটিকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুষতে দেন। লোকটি নাকি এর কারণে বলেন যে, তিনি তিনবার তীর্থভ্রমণ করতে যান। কিন্তু তৃতীয়বার তীর্থ ভ্রমণের সময় তীর্থ স্থানে গিয়ে দেখতে পান অগ্নি কোণে সাদা কাপড়ে ভান্তে দাঁড়িয়ে বলছে কেন কষ্ট করে এখানে এসেছো, তোমাদের দেশে অনেক কিছু আছে। তুমি

সেখানে অনেক মূল্যবান সম্পদ পেতে পারো। লোকটি আরো বললেন, আজ আমি সে মূল্যবান সম্পদ পেয়েছি।

উনাইনপুরার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা গৈড়লা, তৎসংলগ্ন বণিক পাড়া হতে দীর্ঘদিন ধরে পেট কামড়ানোর যন্ত্রণায় ভুগতে থাকা এক ব্যক্তি পেট কামড়ানোর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ভন্তের নিকট এসে ভান্তের পাশে রাখা পিকদানি হতে ভন্তের থুথু মিশ্রিত পানি পান করতে চাইলেন। ভন্তে লোকটিকে বাধাদান সত্ত্বেও লোকটি তা পান করতে চাইলে তাঁর সেবক ধর্মসেন ভন্তেকে ডাকা হল। তিনি এসে দেখলেন পিকদানির দুদিকে দুজনে শক্ত করে ধরে আছে। এ অবস্থা দেখে ধর্মসেন ভন্তে লোকটিকে বললেন, আপনি গ্লাসে করে পানি নিয়ে আসেন। লোকটি পানি আনলে ভন্তে সেই পানি স্পর্শ করে দিলেন। লোকটি সে পানি পান করে সারাজীবন ঐ রোগের মাধ্যমে আর কষ্ট পাননি।

উনাইনপুরা ঢুকতে পালপাড়া নামে একটি পাড়া আছে। সেখানের অধিবাসী অবিনাশ চন্দ্র পাল নামে এক ব্যক্তি একটি রোগে ভুগতেন। তিনি শ্রদ্ধেয় ধর্মসেন ভন্তের পরামর্শ মতে জ্ঞানীশ্বর ভন্তের সেবা করে সুস্থ হয়ে যান। এছাড়াও অনেকে ভান্তের স্পর্শিত পানি পান করে বিবিধ রোগারোগ্য হয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় আর্যশ্রাবক ভন্তে আম, কাঁঠাল, পেঁপে, বাঁধাকপি, মিষ্টি ইত্যাদি খেতে বেশী পছন্দ করতেন। ১৯৭৪ সালের কার্তিক মাসের দিকে আর্যশ্রাবক ভান্তে একদিন ছোয়াইং খেতে বসেছেন হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে চোখ বন্ধ করলেন, এভাবে পনের বিশ মিনিট থাকার পর দেখা গেল ভাগ্যধর বড়ুয়া নামে এক দায়ক মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। যথারীতি বুদ্ধকে মিষ্টি তোলে ভান্তের মুখের কাছে মিষ্টি নেয়ার সাথে সাথে ভান্তে মুখ খুললেন এবং একনাগাড়ে ৪৫টি মিষ্টি খেলেন অথচ পরবর্তীতে ভান্তের কোন অসুবিধা হয়নি।

একদা তদীয় প্রশিষ্য চট্টগ্রাম দেবপাহাড় পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা, কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাথের শ্রামণ্যকালে শ্রদ্ধেয় ভান্তেকে স্নান করানোর সময় বুঝা গেল তিনি যেন কারো সাথে কথা বলছেন, পরে জিজ্ঞেস করে জানা গেল তাঁর কাছে পরলোকগতগণ বন্দনা করতে এসেছেন এবং একথা তিনি কাউকে না বলার জন্যও নির্দেশ দেন। যথার্থ যোগীগণ এমনই প্রচার বিমুখ।

অন্য সময় তিনজন মুসলমান ছাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ভান্তের কাছে জানতে এল তারা পাশ করবে কিনা। উত্তরে ভান্তে বললেন যাও, যাও। তারা চলে যাওয়ার পর পাশ সম্পর্কে উত্তর না দেবার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজন মাত্র পাশ করবে। অন্য দু'জন কষ্ট পাবে বলে বলিনি। পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলে দেখা গেল পাশ করা ছাত্রটি আসল এবং তার থেকে অন্য দু'জন সম্বন্ধে জানা গেল।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে হানাদারদের ভয়ে সেবক শিষ্য ধর্মসেন ভান্তে গ্রাম ত্যাগের জন্য বলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, বেটা বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ নাম উচ্চারণ কর, কিছুই হবে না। সত্যিই দেখা গেল উনাইনপুরাসহ সমগ্র ৯নং ইউনিয়ন বিপদমুক্ত থাকে। জীবনের অন্তিম সময়ে মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ভন্তে বেশি অসুস্থ হলে তার রোগ শয্যার পাশে সবসময় অবস্থান করতেন সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাথের, বিনয়ধর প্রিয়দর্শী মহাথের, ডাঃ নেত্ররঞ্জন বড়ুয়া, ডাঃ বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া এবং মাস্টার সুভাষ বড়ুয়া। তাঁরা ভন্তের কক্ষ হতে বের হয়ে আসলে কক্ষ হতে শ্রুতিমধুর শব্দ শোনা যেত, আবার কক্ষে গেলে শোনা যেত না। তাঁর কক্ষ জুড়ে একটা সুগন্ধি লেগে থাকত।

আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির যখন মহাপ্রয়াণ করলেন তখন তাঁর মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হলো। আশ্চর্যের ব্যাপার হল দীর্ঘদিন পরও তাঁর শরীরের বর্ণ পরিবর্তন হলো না, হলুদ বর্ণ রয়ে গেলো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এবং অদ্ভুত বিষয় হল তাঁর মৃতদেহ যখন জন্মভূমি মুকুটনাইট গ্রামে দেওয়া হলো। তখন উক্ত গ্রামবাসী ট্রাকে সাজিয়ে কালুরঘাট এবং দক্ষিণে দোহাজারি পর্যন্ত প্রদক্ষিণ শেষে যখন সাধনপীঠ উনাইনপুরা গ্রামে প্রবেশ করছিলেন সে সময় রাস্তার দু'ধারে বৃক্ষের উপর সাপ এসে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ চিত্র সবার দেখা। সাপ তাঁকে খুব বেশি ভালবাসত এবং এসে সঙ্গ দিতে ভালবাসত বলে উনাইনপুরায় তাঁর শ্মশান চৈত্যে মর্মর মূর্তির উপর সাপের মূর্তি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁর শ্মশানে যখনই অগ্নি সংযোগ করা হয় সাথে সাথে ভন্তের মৃতদেহ পশ্চিমমুখী হয়ে যায় এবং মেঘহীন আকাশে বেশ কয়েক ফোটা বৃষ্টিপাত হয়।

একদা রাত ৯টা পেরিয়ে কয়েক মিনিট হবে। সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাথেরোর একান্ত সচিব ও শিষ্য ভিক্খু ধর্মেশ্বর ভন্তের চৈত্য ডালা বন্ধ করে একটি ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে মূল মন্দিরে ফিরার সময় পিছনে তাকিয়ে দেখলেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গে চৈত্যের ভিতর লাল হয়ে গেছে, মনে করলেন মোমবাতি থেকে ভন্তের মূর্তির কাঠের বাক্সে আগুন লেগে গেছে এবং দৌড়ে গিয়ে দেখলেন স্বাভাবিক ভাবেই বাতিটা আবার জ্বলছে।

এছাড়া ১৯৯১ সালে একজন চোর মারাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণ উনাইনপুরায় বৌদ্ধদের আক্রমণ করতে আসে। বিহারস্থগণ গেইটের তালা বন্ধ করে মূল মন্দিরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করলে আক্রমণকারী হাতে নিয়ে আসা বোতল, ইট, পাটকেল ইত্যাদি ভন্তের চৈত্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। যখন অবস্থা শান্ত হলো তখন বের হয়ে দেখা গেল ভন্তের চৈত্যের দরজা জানালার একটি কাঁচও ভাঙেনি। উল্লেখ্য, ভন্তের দান বাক্সের টাকা চুরি করতে গিয়েই ঐ চোরটি গণপিটুনিতে মারা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, গ্রামের সকলের নিরাপত্তার জন্য সরকার একমাসব্যাপী পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুলিশগণ পালাক্রমে বিহারের দ্বারে পাহারা

দিতেন। যখন রাত বারটা বাজতো তখন একটি ছোট পাখি এসে ভন্তের চৈত্যের চূড়ায় বসত আর রাত একটা বাজলে পাখিটি স্থান ত্যাগ করে চলে যেতো। উক্ত ঘটনা মহামান্য সংঘরাজ ধর্মসেন মহাথের মহোদয়কে বললে তিনি উক্ত পাখিটির কোন ক্ষতি না করার পরামর্শ দেন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে তাঁর আশীর্বাদ ধন্য অনাথপিতা কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাথেরর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর স্মৃতি মন্দির। এ মন্দির সংস্কারের সময় কর্মরত মিস্ত্রীদের কাজ করার সময় পার্শ্ববর্তী একটি ঘরের চালের উপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাজ করতে হয়েছিল। বাড়ির মালিক তা সহ্য করতে না পেরে গালি-গালাজ দিয়েছিল। অভাবনীয়ভাবে দেখা গেল পরদিন লোকটি মারা গেল। আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় হল ভন্তের মন্দিরে বাল্ব বেশী দিন টেকেনা। খুব অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়। এর কুল কিনারা আমরা এখনো হদিশ করতে পারিনি।

আমাদের মত উন্মাদ সদৃশ্য পৃথগ্‌জনেরা এটুকুই বলতে পারি যে, তিনি একজন উর্ধ্বমার্গের অসাধারণ মহাভিক্ষু। তাঁকে বুঝতে পারবে তার মত অন্য মহাযোগী। তাইতো এই মহান আর্যশ্রাবককে বৌদ্ধরা আর্যপুদ্‌গলরূপে, হিন্দুরা সিদ্ধপুরুষরূপে এবং মুসলমানেরা পীররূপে সমভাবে শ্রদ্ধা জানায় অদ্যাবধি। বুদ্ধ ভগবান বলেছেন –

"নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নত্থি অঝায়তো,
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ সবে নিব্বানসন্তিকে।"

অপ্রাজ্ঞের ধ্যান হয় না, ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না। যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সমীপবর্তী।

আর্যশ্রাবক জ্ঞানতাপস জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনায় বুঝা যায় তাঁর প্রজ্ঞাও ছিল, ধ্যানও ছিল, আর তাইতো তিনি হয়েছেন আর্যশ্রাবক ও মহাযোগীরূপে সর্বজন বন্দিত বুদ্ধপুত্র।

শিষ্য সংগঠন ঃ "সংঘো রক্‌খতি শাসনং" এ বাক্যাবলম্বনে মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর বহু প্রতিভাদীপ্ত শিষ্যের জন্ম দিয়েছেন শাসনের মঙ্গল ও রক্ষার তাগিদে। যাঁরা সমাজের জন্য, জাতির জন্য আশীর্বাদতুল্য। তন্মধ্যে বর্তমান সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাস্থবির, অখিল ভারতীয় সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাস্থবির, ড. জিনানন্দ, শীলানন্দ ব্রহ্মাচারী, অধ্যাপক বোধিপ্রিয়, ডাঃ আশীষ বড়ুয়া এবং প্রশিষ্যগণের মধ্যে কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাস্থবির, ড. বোধিপাল ভিক্ষু, বোধিমিত্র স্থবির, ভিক্‌খু ধর্মেশ্বর, শরণসেন ভিক্ষু উল্লেখযোগ্য। আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর ভান্তে শুধু শিষ্য সংগঠন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি শাসনের ঐক্য ও শান্তির জন্য আমরণ প্রয়াস চালিয়েছেন।

যেমন ১৯৬৬ সালে নিকায় মিলন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার কার্যকরী সভার একটি অধিবেশন উনাইনপুরা লঙ্কারামে হয়, সেখানে উভয়

নিকায় মিলনের এক প্রস্তাব হয়, তাতে তিনি বলেন ব্রহ্মদেশ ও শ্রীলংকা হতে পরিশুদ্ধ নিকায়ের অন্ততঃ পাঁচজন ভিক্ষু আনয়ন করে তাঁরাই কর্মবাক্য পাঠ করুক, আমরা উভয় নিকায়ের ভিক্ষুরা কর্মবাক্য শ্রবন করব। তাতে আমরা উভয় নিকায় মিলে এক হব। এতে সংঘরাজ নিকায়ের কতিপয় ভিক্ষু জোর আপত্তি উত্থাপন করলে অতিপুজ্য জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির আবেগ ভরাকণ্ঠে বলেন, আমি আমার এতদিনের ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনঃভিক্ষু হব, সবার ছোট হব, আসুন আমরা সবাই মিলে যাই। তাঁর এই আবেগভরা কণ্ঠে হয়তো অতিমানবীয় শক্তি ছিল। আর তাই সমবতে ভিক্ষু সংঘ সকলেই তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। শাসন হিতৈষী এ মহাযোগী বলতেন, বাবা ভিক্ষুদের ময়লা হল টাকা আর নারী। এ দুই জিনিস হতে সরে থাকতে পারলে ভিক্ষুত্ব কারো লাথি মারলেও যায় না।

বিনয় গারবতা ও বচনামৃত ঃ আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের বিনয় গারবতা ও বুদ্ধ ভক্তি ছিল অপ্রমেয় ও অসাধারণ এবং সর্বসাধারণের শিক্ষনীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। এ পর্যায়ে তাঁর বিনয় গারবতার কিছু দৃষ্টান্ত ও তাঁর কিছু অমূল্য কথন এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

এক সময় তাঁর গায়ে প্রচন্ড বাত-বেদনা উৎপন্ন হয়েছিল। কোনমতেই বেদনা উপশম না হওয়াতে ভান্তের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ নেত্ররঞ্জন বড়ুয়া হোমিও পাউডারের সাথে চিনি মিশ্রিত করে ভান্তেকে চোখ বন্ধ অবস্থায় খাওয়ালেন। তাতে ভান্তে চোখ খুলে ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন, মামা তুমি আমাকে শেষ করলে, অর্থাৎ অগচ্ছিত জিনিস খাওয়ালেন বলে দুক্কট আপত্তি হল এবং সাথে সাথে ধর্মসেন ভন্তেকে ডেকে আপত্তি দেশনা করেন।

এক বৎসর অগ্রমহাপন্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সাথে যখন শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর ভন্তে বুদ্ধগয়ায় বর্ষাব্রত যাপন করছেন, সে সময় বর্ষাবাসকালে বাংলাদেশ হতে প্রবীণ পন্ডিত, বৌদ্ধ দার্শনিক বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী এক ভিক্ষু নিয়ে বুদ্ধগয়ায় যান। বর্ষাবাস সময়ে ভিক্ষুর তীর্থ ভ্রমণে তথাকার শ্রীলংকান ভিক্ষুগণ এ নিয়ে ভন্তেকে বললেন। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর ভন্তে তখন সে ভিক্ষুকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে ভিক্ষু বললেন, ভন্তে! আমাকে বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী এনেছেন। তখন ভন্তে বললেন, মুৎসুদ্দী ভিক্ষু না, তুমি ভিক্ষু? ভিক্ষুটি এ বিষয়ে বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দীকে গিয়ে বললেন। মুৎসুদ্দী ভন্তেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে! বর্ষাবাস সময়ে তীর্থে আসলে কি হয়। ভন্তে চিন্তা করলেন, ইনি পন্ডিত, ইনাকে ধর্ম বিনয়ের কথা বললে অনেক প্রশ্ন এসে যাবে। তাই তিনি মুৎসুদ্দী বাবুকে বললেন, আপনি পন্ডিত, ধর্ম বিনয় জানেন, আপনাকে কিইবা বলব। তখন মুৎসুদ্দী বাবু বললেন, আমি ধর্ম বিনয় জানলেও আপনাকে বলতে হবে। তখন ভন্তে বললেন মুৎসুদ্দী মহাশয়, ভগবান বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছেন, বর্ষাব্রত পালন করবার জন্য। তিনি বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাব্রতের সময় কোথাও রাত্রি যাপন করিও না। এই

অনুজ্ঞা লঙ্ঘনে ভিক্ষুদের আপত্তি হবে, যেমন ছেলে পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করলে ছেলের কি দোষ হবে না? তেমন ভগবান বুদ্ধের আদেশ লঙ্ঘনে ভিক্ষুদের দোষ হবে। এই কথা বলার সাথে সাথে বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী বললেন, ভন্তে! আমারই দোষ, ভিক্ষুর দোষ নয়। তিনি আসতে চান নাই, আমি জোর করে নিয়ে এসেছি, আমারই ভুল হয়েছে।

একসময় জনৈক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করেন, ভন্তে! বেদনা কাকে বলে? ভন্তে বললেন, বেদনা কি এই কথা আর কাউকে জিজ্ঞাসা করেছেন? তিনি বলেন হ্যাঁ, কয়েকজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করেছি ভন্তে। তখন ভন্তে চিন্তা করে ভাবেন নিশ্চয় তাঁরা বেদনা ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরাও পন্ডিত। হঠাৎ ভন্তে রেগে আক্রোশ করে বললেন, আপনি আমার বাবার বন্ধু একজন প্রবীণ শিক্ষিত, পন্ডিত ও জ্ঞানীলোক সামান্য বেদনা কি বুঝতে পারেন না, আপনি কেমন লোক? তাতে ভদ্রলোক খুবই মর্মাহত হয়ে ভাবেন ভন্তেকে প্রশ্ন করাতে ভন্তে এভাবে আমাকে রেগে বললেন কেন? কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভন্তে বললেন, বাবু এবার বেদনা কাকে বলে বুঝেছেন? হ্যাঁ ভন্তে! এবার খুব ভালভাবে বুঝেছি, লোকটি বললেন।

শ্রদ্ধেয় মহাযোগী জন্মবারে সকাল বেলায় প্রদত্ত খাওয়া না খেয়ে তা দিয়ে বুদ্ধ পূজা করে দিতেন। এতে মহামান্য সংঘরাজ শীলালংকার ভন্তে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন- বুদ্ধ পূজায় দ্রব্য নিয়ে পূজা করা হচ্ছে। আপনি না খেয়ে কেন বুদ্ধ পূজা করছেন? তখন ভন্তে বললেন, হে শীলালংকার! কত যে জন্মগ্রহণ করেছি তার কোন ইয়ত্তা নাই। এই জন্মে বুদ্ধ শাসনে জন্ম নিয়েছি, তাই আমার পরিশুদ্ধ বস্তু দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করছি।

লংকারামে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বন্দনা করবার সময় সূত্রপাঠ, মৈত্রী ভাবনা ও বর্তমান অতীত প্রত্যবেক্ষণ করা হত। এটি ছিল জ্ঞানীশ্বর ভান্তের নির্দেশ। পূজনীয় শীলালংকার ভন্তে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, বন্দনার সময় অতীত প্রত্যেবেক্ষণ বলতে হয়, বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ কেন বলব? তদুত্তরে ভন্তে বললেন, বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ বুদ্ধভাষিত আর অতীত প্রত্যবেক্ষণ শ্রাবক ভাষিত। বুদ্ধ ভাষিত বাণী মূল্যবান, তাই বলা ভিক্ষু শ্রামণের বেশী প্রয়োজন।

আবার ১৯৪৫ সালে তদীয় শিষ্য পরবর্তীতে যিনি অখিল ভারতীয় সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের তিনি তাঁর গুরু জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের জীবনী সংগ্রহের নিমিত্তে আসলে এক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোন স্তরে? সাথে সাথে ভান্তে রেগে বললেন, তোমাদেরকে কি আমি পারাজিকা সম্পর্কে শিক্ষা দিইনি? এই বলে তিনি জীবনী বলা বন্ধ করে দিলেন। কি অপরিসীম বিনয় গারবতা!

বুদ্ধের সেই আদেশ, "বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু" তা আজীবন তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে পালন করেছেন। বুদ্ধ পূজার জন্য তাঁর অন্তর ছিল অতি উদগ্রীব। কেউ

কিছু তাঁকে দান করলে তা থেকে আগে বুদ্ধকে পূজা করতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি প্রতি সপ্তাহে তাঁর জন্মবারের দিন সকালের বেলা তাঁর অংশের ছোয়াইং সমুদয় দিয়ে তিনি বুদ্ধ পূজা করতেন এবং বলতেন আমার নিকট ধন-দৌলত নেই, আমার আছে ভক্তি আর প্রেম। তিনি একদা বুদ্ধ প্রতিবিম্বের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অপলক নয়নে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আজ আমি নয়ন জলে বুদ্ধ পূজা করলাম। তিনি বলতেন আমি বুদ্ধের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ করি। বুদ্ধ আমার মাথার মণি। দানের প্রতি, মহান সংঘের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। একদিন তিনি বললেন, আমি কঠিন চীবর দান করব। কর্তালা বিহারে কঠিন চীবর দান হবে আমাকে সেখানে নিয়ে চল। তিনি একটি উত্তম-চীবর মাথায় করে নিলেন আর তাঁকে চেয়ারে করে কর্তালা নেয়া হল। কর্তালা বিহারে পৌঁছে তাঁর পরম হিতৈষী তথাকার অধ্যক্ষ, বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরকে স্বহস্তে চীবরটি দান করে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। উনাইনপুরা লংকারামে ভিক্ষুসংঘ আসলে তিনি বলতেন, ভিক্ষু সংঘের জন্য উত্তম আসন ও পানীয় প্রস্তুত কর এবং পানীয় দিয়ে তিনি সংঘ পূজা করে বলতেন, পানীয় দিয়ে আজ আমি সংঘ পূজা করলাম।

মহাযাত্রা ঃ "সব্বে ধম্মা অনাত্তি" - সমস্ত ধর্মই অনিত্য। মহাযোগীর ক্ষেত্রে তা ব্যত্যয় হবে কেন! তিনি দীর্ঘদিন বাত ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন। কোষ্ঠকাঠিন্যও তাঁকে অনেক ভুগিয়েছে। মলত্যাগ করতে তিনি প্রচন্ড কষ্ট পেতেন। তাঁর অন্যতম সেবক বর্তমান কর্মবীর অনাথ পিতা সত্যপ্রিয় মহাথের মলদ্বারে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পর্যন্ত মল বের করতেন। তথাপি যোগী প্রবর নির্বিকারভাবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করতেন। ধীরে ধীরে তাঁর রোগ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

২৮ অক্টোবর ১৯৭৪ইং, ১৩৮১ বাংলার ১০ কার্তিক, সোমবার সেবক শিষ্য ধর্মসেন ভান্তেকে ডেকে বললেন আমি আর উঠব না। শিষ্যও জানেন গুরুর বাক্যের অন্যথা হবে না। তবুও নিয়তির বিধানে নশ্বর নিয়মে কিছুই করার নেই। শোকাহত শিষ্য সেবারত হলেন। সারাটা দিবস যেন এক অসস্তিময় দিবস হিসেবে অতিবাহিত হল। ক্রমে সন্ধ্যা হল, প্রবারণা ত্রয়োদশী চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিহার প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে অনেক ভক্ত আসতে লাগল। শিষ্যকে ক্ষীণ কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন সূত্রপাঠের। শিষ্য ধর্মসেন সূত্রপাঠ করছেন আর যোগীবর গভীরভাবে তা শুনছেন। তৎসঙ্গে মহাযোগীর শ্রীমুখে নেমে এসেছে আলোকিত করা অনির্বচনীয় প্রশান্তি। পবিত্র বদন মন্ডলে সে প্রশান্তি রেখেই রাত ৮.২০ মিনিটে সকলকে শোকাকুল করে মহাযোগী মহাযাত্রা করলেন মহাকালের পথে।

মহাযোগী, জ্ঞানতাপস, মৈত্রী করুণার মূর্ত প্রতীক, আদর্শিক বুদ্ধপুত্র আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির উদয় বিলয়ধর্মী এ জগত হতে বিদায় নিলেও

তাঁর অনুপম জীবনাদর্শ ও হিতোপদেশ আমাদের সকলের জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাঁর মতন ধীমান, যশস্বী, ভিক্ষুকুল তিলক জগতের দুর্লভ রত্ন ও ভূষণ সদৃশ। এহেন সুমহান সংঘপুরুষকে তাঁর জীবনী সংক্ষেপ যবনিকাপাতের লগ্নে প্রণতি জানাই এ বলে –

"স্থাপকায় সদ্ধর্মস্য মহাপ্রাজ্ঞ সরুপিনে
ভিক্ষুনাম চ গরিষ্টায় অরিযসাবক
জ্ঞানীশ্বরতেঃ নম!!"

তথ্য ঋণ ঃ

* ধম্মপদ - লেখক, পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির
* অর্থ সমন্বিত প্রত্যয় শতক - লেখক, জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু
* সংঘ সান্নিধ্যে - লেখক, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
* সঞ্চয়িতা - লেখক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির - লেখক, ড. জিনবোধি ভিক্ষু
* প্রশস্তি - সম্পাদক, লায়ন নৃপতি রঞ্জন বড়ুয়া (মুকুটনাইট) - ১৯৯৯
* জ্ঞানোদয় স্মরণিকা, সম্পাদক, সুমনতিষ্য শ্রমণ (দেবপাহাড়) - ২০০৬
* জ্ঞানোদয় স্মরণিকা, সম্পাদক, প্রমোতোষ বড়ুয়া (দেবপাহাড়) - ২০০৮
* মহাজ্ঞানী মহাজন, সম্পাদক, চন্দ্রজ্যোতি ভিক্ষু (মুকুটনাইট) - ২০০৯
* জ্ঞানোদয় স্মরণিকা, সম্পাদক, প্রকাশ বড়ুয়া (শীলকূপ) - ২০১১

ইদং মে পুঞ্ঞং পঞ্ঞালাভায় সংবত্ততু।
নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু'তি।

তাঁর অনুপম জীবনাদর্শ ও হিতোপদেশ আমাদের সকলের জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাঁর মতন ধীমান, যশস্বী, ভিক্ষুকুল তিলক জগতের দুর্লভ রত্ন ও ভূষণ সদৃশ। এহেন সুমহান সংঘপুরুষকে তাঁর জীবনী সংক্ষেপ যবনিকাপাতের লগ্নে প্রণতি জানাই এ বলে –

"স্থাপকায় সদ্ধর্মস্য মহাপ্রাজ্ঞ সরুপিনে
ভিক্ষুনাম চ গরিষ্টায় অরিযসাবক
জ্ঞানীশ্বরতেঃ নম!!"

তথ্য ঋণ ঃ

* ধম্মপদ - লেখক, পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির
* অর্থ সমন্বিত প্রত্যয় শতক - লেখক, জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু
* সংঘ সান্নিধ্যে - লেখক, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
* সঞ্চয়িতা - লেখক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির - লেখক, ড. জিনবোধি ভিক্ষু
* প্রশস্তি - সম্পাদক, লায়ন নৃপতি রঞ্জন বড়ুয়া (মুকুটনাইট) - ১৯৯৯
* জ্ঞানোদয় স্মরণিকা, সম্পাদক, সুমনতিষ্য শ্রমণ (দেবপাহাড়) - ২০০৬
* জ্ঞানোদয় স্মরণিকা, সম্পাদক, প্রমোতোষ বড়ুয়া (দেবপাহাড়) - ২০০৮
* মহাজ্ঞানী মহাজন, সম্পাদক, চন্দ্রজ্যোতি ভিক্ষু (মুকুটনাইট) - ২০০৯
* জ্ঞানোদয় স্মরণিকা, সম্পাদক, প্রকাশ বড়ুয়া (শীলকূপ) - ২০১১

ইদং মে পুঞ্ঞং পঞ্ঞালাভায় সংবত্ততু।
নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু'তি।

লেখক পরিচিতি

চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত শীলকূপ একটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত নৈসর্গিক শোভামন্ডিত নয়নাভিরাম পল্লী। এই বর্ধিষ্ণু পল্লীর সংঘ সন্তান ও কৃতি গৃহী সন্তানেরা সমাজের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন। ঐতিহ্যবাহী এই পল্লীর ধার্মিক পরিবারে শ্রদ্ধাবান উপাসক অবিরত বড়ুয়ার দ্বিতীয় পুত্র ধর্মপ্রাণ উপাসক অরূপ বড়ুয়া ও শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা গোপা বড়ুয়ার কোল আলোকিত করে ১৯৮৫ইং ১ মে, ১৩৯৩ বাংলার ৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার লেখক এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু জন্মগ্রহণ করেন। একাদশ সংঘরাজ সু-সাহিত্যিক শাসনশ্রী মহাস্থবির তার নামকরণ করেন নিপুন বড়ুয়া। দু'ভাই নিপুন ও পিন্টু এবং দু'বোন স্মৃতি ও সোমা বড়ুয়ার মধ্যে তিনি প্রথম। তিনি ২০০৩ইং ৩১ জানুয়ারি বাঁশখালী কেন্দ্রীয় শীলকূপ চৈত্য বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ কর্মবীর দেবমিত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর তিনি স্বীয় পিতৃব্য ভদন্ত লোকপ্রিয় মহাস্থবিরের কাছে উত্তর পুরানগড় সার্বজনীন সংঘশ্রী বিহারে ২০০৩ হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা নেন এবং ২০০৫ সালের অক্টোবর হতে আজ অবধি চট্টগ্রাম মহানগরীর দেবপাহাড়স্থ পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে অনাথপিতা কর্মবীর সত্যপ্রিয় মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি ২০০৬ইং ৮ অক্টোবর সংঘশ্রী বিহারের পাষাণ সীমায় অধ্যাপক জ্ঞানরত্ন মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা লাভ করেন। তার ধর্মপিতা-মাতা হলেন উত্তর পুরানগড় নিবাসী ধর্মপ্রাণ উপাসক আদর্শ বড়ুয়া ও তৎস্ত্রী অনিমা বড়ুয়া। তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে লেখা-লেখিতে জড়িত হন। এর আগে তিনি ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটি তার দ্বিতীয় গ্রন্থ। এছাড়াও তার লেখা ২০টির মত প্রবন্ধ ও ২৫টির মত কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি ২০০৩ সালে এসএসসি, ২০০৫ সালে এইচএসসি পাস করে বর্তমানে বিএসএস (অনার্স) শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি সমাজকে আরো মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেবেন। আমি এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষুর নিরোগ দীর্ঘায়ু সমৃদ্ধময় জীবন ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সুমনতিষ্য ভিক্ষু
পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার
দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।